‘কোনো প্রকাশক ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যক্তি এসে যদি টাকা নেয়ার কথা বলতে পারে প্রমাণ লাগবে না আমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবো’

এহছানুল হক মিলন *শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী*

পাঠ্যপুস্তক সমস্যা নিরসন ও নকল প্রতিরোধ অভিযানে সফল মন্ত্রী এহছানুল হক মিলন। সাম্প্রতিক সময়ে তার বিরুদ্ধে ওঠা কিছু অভিযোগ নিয়ে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেছেন... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**

সাপ্তাহিক ২০০০ : নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আপনার কর্মকান্ড প্রশংসিত হয়েছে। কিছুটা হলেও সফল হয়েছেন। পরীক্ষার সময় বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে দেখা যায় আপনাকে। এমন সময় কবে আসবে যখন নকল ঠেকানোর জন্য আপনাকে আর এভাবে দৌড়াতে হবে না?

এহছানুল হক মিলন : সেই অবস্থা এ বছরই আসবে। এখন ক্লাসরুম এডুকেশন, শিক্ষকদের গুরুত্ব দেয়া, তাদের ট্রেনিং করানো- এগুলো হলেই নকল একেবারে শেষ হয়ে যাবে। সিস্টেমটাকে পাল্টানোর কার্যক্রম এখন আমরা হাতে নিয়েছি। স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন, প্রাক-মূল্যায়ন পরীক্ষা, স্কুল লেভেলে টেস্ট পরীক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের কমন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া এবং একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরীক্ষা দিতে না দেয়া ছাড়াও আরো কিছু কার্যক্রম কার্যকর হলেই নকল করার প্রবণতা একদম বন্ধ হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নকল করার মতো পরিবেশ এখন আর নেই। স্লোগান দেয়া, মব অ্যাটাক করা- এগুলো আমরা বন্ধ করেছি। ১৪৪ ধারা জারি করা, কেন্দ্রগুলোর পাশে ফটোকপি মেশিন না থাকা, ক্লাসরুমের ভেতরে পানি না দেয়া, সবচাইতে কার্যকরী যেটা আমি করেছি সেটা হচ্ছে, দেহ তল্লাশি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেহ তল্লাশি করে গেটে নকল ধরে বহিষ্কার করা নিয়ে কিছুদিন আগে বিতর্ক উঠেছিলো। প্রশাসনিক পর্যায়ে কেউ কেউ এর বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিবও এ বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন?

এ. হ. মিলন : তিনি শুধু আপত্তি জানাননি। আমার নির্দেশাবলীর কাউন্টারে ডিও লেটারও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা অ্যাক্টে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, ক্লাসে ঢোকার সময় একজন ছাত্র/ছাত্রী প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ক্যালকুলেটর ছাড়া এর বাইরে কিছু আনতে পারবে না। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী হলের ভেতরে ‘অবৈধ কাগজপত্র’ নিয়ে প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নেই। অবৈধ কাগজপত্র সহ ছাত্র/ছাত্রী ধরা পড়লে শুধু বহিষ্কার নয়, আইন প্রয়োগেরও সুযোগ রয়েছে।

২০০০ : ধরুন আপনি আগামী বছর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে আর থাকছেন না। আপনার জায়গায় যিনি আসছেন, তিনি আপনার মতো কেন্দ্রে কেন্দ্রে নকল ধরছেন না। অর্থাৎ আপনি নকল সম্পর্কে যে ভীতিটা তৈরি করেছিলেন সেই ভীতিটা আর থাকছে না। সে ক্ষেত্রে কি এখনকার মতো পরিস্থিতি থাকবে নাকি আবার নকলের মহোৎসব দেখবো?

এ. হ. মিলন : নকল বন্ধ করার জন্য আগামী বছর আমার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকতে হবে না। নকল প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনগণকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। শিক্ষকদের নিরাপত্তা দিতে পেরেছি। জেলা প্রশাসক, পুলিশের নকল বন্ধ করার জন্য যা করার দরকার সেটা তারা করছে। রাজনীতিবিদরা এখন শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছে। অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা এখন অনেক বেশি সচেতন। সেই কারণেই আমি মনে করি, নকল সমস্যা নিয়ে ভাববার দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, নকল আর হবে না।

২০০০ : পাঠ্য পুস্তক বিতরণে যে সমস্যা

ছিলো সেটাও কি একেবারে সমাধান হয়েছে?

এ. হ. মিলন : বিগত সরকারের সময় এনসিটিবি বই প্রিন্টার প্রতি হাজার প্রতি ফর্মার দাম ছিল ৭৪ টাকা। ২০০১ সালে পুস্তিকা একক কোম্পানি হিসেবে দাম নিয়েছিল ৫৪ টাকা। বর্তমান সরকার আসার পর আমরা এই মার্কেটটিকে উন্মুক্ত করে দেই। টেন্ডারে দাম কমে যায়। মার্কেটে এতে দাম গিয়ে দাঁড়ায় পর্যায়ক্রমে ৪২ থেকে ৩৮ টাকা এবং একক ঠিকাদারের চেয়ে এটা ৪০০ ঠিকাদারের হাতে কাজটি চলে যায় এবং কাজটিও সময়মতো উঠে আসে। এখন যেভাবে চলছে সেভাবে চললে সমস্যা আর হবে না।

২০০০ : ৫৪ থেকে ৪২ টাকায় কিভাবে নেমে এলো?

এ. হ. মিলন : প্রতিযোগিতা। ৪০০ ঠিকাদার রয়েছে তাই। ৭৪ থেকে ৫৪ টাকা হয়েছিল আওয়ামী লীগের সময়। ৫৪ থেকে ৪২ টাকায় এসেছে আমাদের সময়। ৪২ থেকে ৩৮ পর্যন্ত আমি নামিয়ে এনেছি হাজার ফর্মা প্রতি।

২০০০ : নকলের ক্ষেত্রে সাফল্যের কারণ কি? আমি জানতে চাচ্ছি, নকল প্রতিরোধে আপনার কৌশলটা কি ছিল?

এ. হ. মিলন : বিরোধী দলের এমপি যখন ছিলাম তখন দেখেছি, আমার কচুয়াকে কীভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষা শুরু হলেই পত্রিকায় ব্যানার, হেডলাইন দেখতাম নকল নিয়ে। কচুয়া উঠে আসতো সেসব বীভৎস ছবিতে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাবার পর আমি পাঠ্যপুস্তক নিরসনের অভিযানে নামি। প্রথম বছরই সফল হই। তারপর পরিকল্পনা নিই নকল প্রতিরোধের। প্রথম যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেটি হচ্ছে, নকলের পাহারাদার শিক্ষকদের নিরাপত্তার বিধান করতে হবে। পরীক্ষা শুরু হবার আগে বলেছি, যদি কোনো শিক্ষককে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমি আমার পদ থেকে সরে দাঁড়াবো। বিগত দিনগুলোতে নকলের জন্য শিক্ষক বহিষ্কার হতো না। নকল না ধরার দায়ে তাদের বহিষ্কার করেছি। শিক্ষকরা যখন বুঝতে পারলো, আমরা তাদের সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেব, তখন তারা হয়ে গেল ক্লাসরুমের পুলিশম্যান। শিক্ষকরা যখন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন তখনই নকল বন্ধ হয়েছে। শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে নকল ঠেকানো কখনোই সম্ভব হতো না। তারপর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি সেটি হচ্ছে, রাজনীতিবিদদের নকল প্রতিরোধ অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। অভিভাবকদের সঙ্গে আনতে চেষ্টা করেছি। ছাত্র, শিক্ষক ও জনতা এ তিনের সমন্বয়ে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এ পর্যায়ে পৌঁছেছি। এ জন্য আমি প্রতিটি বোর্ডে মোটিভেশনাল ক্যাম্পেইন করেছি। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সবার সঙ্গে কথা বলেছি। জানতে চেয়েছি নকল প্রতিরোধ কীভাবে সম্ভব। তাদের বোঝাতে চেয়েছি, আমরা কি চাই এবং জানতে চেয়েছি এর জন্য কি কি করতে হবে। সেভাবেই আমরা এগিয়েছি। নকল বন্ধে এ ধরনের মোটিভেশনাল ক্যাম্পেইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কেন্দ্রগুলোতে হঠাৎ পরিদর্শন নকল প্রতিরোধে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে।

যখন ছাত্র, শিক্ষকরা কর্মকর্তারা জানে, প্রতিমন্ত্রী যখন-তখন, যেখানে-সেখানে পরিদর্শনে আসতে পারেন, তখন সবাই সতর্ক ছিল। গ্রামের স্কুলগুলোতে এমনকি রিমোট এরিয়ায়ও গিয়েছি। পার্বত্য জেলার প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়েছি। কোনো এসপি, ডিসিকে আমরা আগে থেকে জানাইনি। কেউ জানতো না আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি।

২০০০ : পরীক্ষা কেন্দ্র হঠাৎ পরিদর্শনের মাধ্যমে আপনি কি এক ধরনের ভীতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন?

এ. হ. মিলন : ব্যাপারটা ভীতি না, আমি চেয়েছি সবার মধ্যে এক ধরনের সতর্কতা তৈরি করতে। তারা সব সময় সতর্ক থাকতো কখন যেন আমি চলে আসি। সে জন্য টেলিভিশনে প্রচার করতাম, আমি যেকোনো সময় যেকোনো কেন্দ্র পরিদর্শনে না জানিয়ে চলে যেতে পারি।

২০০০ : এই হঠাৎ পরিদর্শনের জন্য আপনি কি হেলিকপ্টার ব্যবহার করতেন?

এ. হ. মিলন : হ্যাঁ।

২০০০ : নকল প্রতিরোধ অভিযানে হেলিকপ্টার ব্যবহার আপনি কবে থেকে শুরু করেছেন?

এ. হ. মিলন : প্রথম বছরে কম করেছি। এসএসসি পরীক্ষায় দু-এক দিন। এইচএসসি পরীক্ষায় সফরের পরিমাণ আরো বাড়ালাম। ২০০২-এ তা আরো বাড়লো। নকল প্রতিরোধে আমার নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল, কোন সময় আমি কতটুকু দৌড় দেবো। এবং সেভাবে আমি দৌড়েছি।

২০০০ : আপনি বলেছেন, হেলিকপ্টারে করে পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়েছেন, মন্ত্রণালয় কি হেলিকপ্টারের এ খরচ বহন করতো?

এ. হ. মিলন : না। এটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত টাকা।

২০০০ : কেন নিজের টাকা খরচ করলেন?

এ. হ. মিলন : হেলিকপ্টার নিয়ে মন্ত্রী পরীক্ষা হল পরিদর্শন করবে, মন্ত্রণালয়ে এমন কোনো নিয়ম নেই। আর কোনো পথও নেই এ ক্ষেত্রে। আমি ব্যক্তিগতভাবে টাকা খরচ করেছি, তার কারণ আমি চেয়েছি নকল প্রতিরোধে সফল হতে। আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ছেড়ে বাংলাদেশে এসেছি কিছু কমিটমেন্টের কারণে। একজন সংসদ সদস্য তার নির্বাচনী কাজে অনেক টাকা খরচ করেন আর আমি সৎ কাজে, দেশের জন্য কিছু টাকা খরচ করেছি। এটা আমি উপভোগ করছি। আমি খুশি, এতে জাতি উপকৃত হয়েছে।

২০০০ : আপনি গত কয়েক বছর নকল প্রতিরোধ কার্যক্রমে নেমে সাফল্য পেয়েছেন। আপনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়কে হেলিকপ্টারের খরচের যৌক্তিকতা বোঝানো সম্ভব ছিল। কিন্তু আপনি কেন মন্ত্রণালয়কে বোঝাতে পারলেন না?

এ. হ. মিলন : মন্ত্রণালয়ে কোনো মন্ত্রীর কেন্দ্র হঠাৎ পরিদর্শনের জন্য হেলিকপ্টার দেয়ার কোনো রেওয়াজ বাংলাদেশে নেই।

‘বোর্ড তার নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছে না। ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফিস নেয়া হয় পরীক্ষা ভালোভাবে সম্পাদনের জন্য। তা দিয়ে কি আপনি বাড়ি বানাবেন? গাড়ি কিনবেন? তা তো হতে পারে না’

একজন মন্ত্রীকে প্রতিদিন ২০ লিটার তেল দেয়া হয়। মন্ত্রীরা তেল পোড়ায়, তাদের পকেট থেকেই পোড়ায়। নকল প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে আমরা প্রতি বছর মিটিং করেছি কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

২০০০ : আপনি কি করতে চেয়েছিলেন? বিরোধিতা কারা করেছিল?

এ. হ. মিলন : অবশ্যই। এ ধরনের ক্ষেত্রে কোনো বাজেট করা হয়নি। বিরোধিতার প্রশ্নটা বাদ রইলো।

২০০০ : হেলিকপ্টারে পরিদর্শনে আপনার কত খরচ হয়েছিল?

এ. হ. মিলন : ২৪ লাখ টাকার মতো। অবশ্য এর মধ্যে আমি প্রচুর ডিসকাউন্ট পেয়েছি। প্রতি বছর চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

২০০০ : নিজের টাকা বলছেন, এই টাকার উৎস কি?

এ. হ. মিলন : আমেরিকায় এখনও আমার ব্যবসা রয়েছে। আমার স্ত্রী সেটার মালিক। আমি স্টাবলিশ ম্যান, সেখান থেকে টাকা পাই।

২০০০ : অভিযোগ উঠেছে চারশ' প্রকাশক ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আপনি এই অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

এ. হ. মিলন : এটি একশত ভাগ মিথ্যা কথা। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য বলা হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে আমার উত্তর হলো। কোনো প্রকাশক ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যক্তি এসে যদি টাকা নেয়ার কথা বলতে পারে, প্রমাণ লাগবে না, আমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবো।

২০০০ : উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কারা এ কাজটি করেছে?

এ. হ. মিলন : শিক্ষা বিটে প্রত্যেকটি পত্রিকায় একজন সাংবাদিক থাকে। গত ৩ বছর যাবৎ আমি কাজ করে যাচ্ছি। ৪০০ ঠিকাদারের কাছ থেকে বোর্ড টাকা নিলে সেইসব রিপোর্টাররাও খবর পেতো। রিপোর্টারদের রিপোর্টিংয়ে একটি প্রতিযোগিতা থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এনসিটিবি'র টাকা-পয়সার লেনদেন আমার কোনো হাত নেই। এটা প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের কাজ। তারা কাগজ কেনে, টেন্ডার দেয়। টাকা নেয়, আমাদের কাজ হলো পর্যবেক্ষণ করা। কাজটি উঠিয়ে দেয়া অর্থাৎ জানুয়ারির ১ তারিখে বই ডেলিভারি দেয়া। বাংলাদেশের ইতিহাসে পর পর তিন বছর তা করতে পেরেছি। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ কেউ এ কাজটি করতে পারে।

২০০০ : আপনার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হলো নকল প্রতিরোধ উদ্বুদ্ধকরণ সভা নিয়ে। ১৫-২০ জন সাংবাদিক নিয়ে

'আমেরিকায় এখনও আমার ব্যবসা রয়েছে। আমার স্ত্রী সেটার মালিক। আমি স্টাবলিশ ম্যান, সেখান থেকে টাকা পাই'

আপনি বোর্ডের এ ধরনের সভাগুলোতে যোগ দিতেন এবং খরচগুলো বোর্ড বহন করতো। বোর্ডের নাকি এমন কোনো খাত নেই?

এ. হ. মিলন : কেন খাত থাকবে না। মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম করার কাজ তো বোর্ডের কাজ।

২০০০ : এর কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল নাকি?

এ. হ. মিলন : কেন থাকবে না আইনগত ভিত্তি? মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে প্রোগ্রামগুলো ঠিক করা হয়েছে। মন্ত্রী, সচিব আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি মোটিভেশনাল প্রোগ্রামের। সে অনুযায়ী চিঠি দেয়া হয়েছে। মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম তো হলো আমাদের কর্মসূচির একটি অংশ ছিল।

২০০০ : এ সরকারের আগে কি এ ধরনের প্রোগ্রাম ছিল?

এ. হ. মিলন : সেটা আমি জানি না। আমার সরকারে আমি এই পলিসি নিয়েছি।

২০০০ : বোর্ড কি এই খরচ বহন করতো?

এ. হ. মিলন : হ্যাঁ।

২০০০ : কিন্তু এই খরচের টাকা বোর্ড দিতে ইচ্ছুক ছিল না?

এ. হ. মিলন : বোর্ড টাকা দিতে বাধ্য। বোর্ডের পরীক্ষা নিতে হবে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেয়া বোর্ডের দায়িত্ব। বোর্ড তার নিজের পকেট থেকে টাকা দিচ্ছে না। ছাত্রদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফিস নেয়া হয় পরীক্ষা ভালোভাবে সম্পাদনের জন্য। আপনি টাকা নিচ্ছেন পরীক্ষা নেয়ার জন্য। তা দিয়ে কি আপনি বাড়ি বানাবেন? গাড়ি কিনবেন? তা তো হতে পারে না।

২০০০ : ঢাকা থেকে সাংবাদিক নেয়ার পরিকল্পনা আসলো কিভাবে?

এ. হ. মিলন : এটি আমাদের প্রচারণার একটি অংশ। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেত্রীর সঙ্গে সাংবাদিকরা যায়। আমি একটি মোটিভেশন প্রোগ্রাম করছি এ ধরনের একট ক্যাম্পেইন প্রোগ্রামে মফস্বলের কোনো সাংবাদিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে না তা হতে পারে না। এটি একজন সাংবাদিকের জন্য বিশেষ এসাইনমেন্ট। এর মাধ্যমে তারা কার্যক্রমকে প্রমোট করবে। এটা একটা প্রমোশনাল অ্যাকটিভিটি। এ জন্যই ঢাকা থেকে সাংবাদিক নিয়ে যেতাম। নকল তো রাতারাতি বন্ধ হয়নি, নকলের ব্যাপারে আমরা কতখানি শক্ত এটা দেশবাসীকে জানিয়েছে সাংবাদিকরা। ভালো রিপোর্ট ও নকল বন্ধের ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে।

২০০০ : তারেক জিয়ার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে অনেকে বলে আপনি মন্ত্রীদের মধ্যে শক্তিশালী এ কথাটি কতটুকু সত্যি?

এ. হ. মিলন : তারেক জিয়া আমাদের আগামী দিনের নেতা আর আমরা বেগম জিয়ার অনুসারি। এরপর তারেক জিয়া। তাই অবশ্যই তার সঙ্গে আমরা ভালো সম্পর্ক থাকবে যে আগামী দিনে আমাদের নেতা হবে। তারেক জিয়া আমাদের যুগ্ম মহাসচিব (১)। তার সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকাটাই হচ্ছে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আমি খুশি হয়েছি যে, তারেক জিয়ার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে আমি এটাই তো চাই।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**